পঞ্চম অধ্যায় (5B)

মহাযাত্রার পদচিহ্ন

(ফসিলগুলো কোথা থেকে এলো)

বন্যা আহমেদ

পূর্ববর্তী অংশের পর…

গত কয়েক বছরে ফসিলবিদেরা বেশ কিছু পালক এবং ডানা সহ ডায়নোসর এর ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন চায়নায়। বিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরেই ধারণা করে আসছিলেন যে, ডায়নোসর থেকেই আধুনিক পাখীর বিবর্তন ঘটেছে। নব্য আবিষ্কৃত এই ফসিলগুলো ডায়নোসর এবং পাখির মধ্যবর্তী স্তরের মিসিং লিঙ্কের প্রতিনিধিত্ব করে (১)।

পাথরের গায়ে টারশিয়ারি যুগের (৫ থেকে ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে) *Salix sp* এর পাতার ফসিল (২)।

এটাই সেই বিখ্যাত 'লুসি'র কঙ্কালের ফসিল। ১৯৭৪ সালে ইথিওপিয়ায় প্রায় ৩২ লক্ষ বছরের পুরনো *Australopithecus afarensis*, এর এই ফসিলটি পাওয়া যায়। এ ধরণের বিভিন্ন ফসিল থেকেই বিজ্ঞানীরা আধুনিক মানুষের এবং তাদের পূর্ববর্তী প্রজাতি গুলোর বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছেন (৩)।

হ্যাঁ, এগুলো ফসিলেরই ছবি। বিজ্ঞানীরা বহু শতাব্দী ধরেই এ ধরনের বিভিন্ন ফসিলের নমুনা সংগ্রহ করে আসছেন, এরকম হাজার হাজার ফসিলের সংগ্রহ রয়েছে পৃথিবীর নানা যাদুঘরে। আগের পর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে, ইদানীং অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, জীবের ডি.এন.এর মধ্যে লেখা ইতিহাস থেকেই বিবর্তনের সম্পুর্ণ ইতিহাসটা পড়ে ফেলা সম্ভব। কিন্তু ডি.এন.এর আবিষ্কার তো হয়েছে মাত্র অর্ধ শতাব্দী আগে, তার আগে ফসিল রেকর্ডই ছিলো বিবর্তনের অন্যতম প্রধান সাক্ষ্য। ভবিষ্যতে আমরা জীবের ডি.এন.এ থেকেই যে তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের অনেক কিছু বলে দিতে পারবো তাতে কোন সন্দেহই নেই। তবে এই মুহুর্তে হাঁটি হাঁটি পা পা করে জেনেটিক্সের বিভিন্ন শাখা বেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলেও তারা এখনও শৈশবের চৌকাঠই পেরোতে পারেনি। বিবর্তনের বিভিন্ন তত্ত্বের প্রমাণ এবং

সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতার ফাঁক পূরণ করতে এখনও কিন্তু এই ফসিল রেকর্ডগুলোই ভরসা! আসলে ফসিল রেকর্ডগুলো না থাকলে সেই উনিশ শতাব্দীতে বসে ডারউইনসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এত সহজে বিবর্তনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

গত দেড়শো বছরে ফসিলবিদরা হাজার হাজার ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন, এবং সেগুলো বিবর্তনবাদের তত্ত্বকে আরও যে জোড়ালো করেছে শুধু তাইই নয়, এখন পর্যন্ত এমন একটাও ফসিল পাওয়া যায়নি যা প্রাণের বিবর্তনের ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। যেমন ধরুন মানুষ প্রজাতির বিবর্তন ঘটেছে মাত্র ১৫০ হাজার বছর আগে, এখন যদি হঠাৎ করে মেসোজয়িক (প্রায় ২৫-১৫ কোটি বছর আগে), প্যালিওজয়িক (প্রায় ৫৪-২৫ কোটি বছর আগে), প্রিক্যাম্ব্রিয়ান (প্রায় ৩৫০-৫৪ কোটি বছর আগে) যুগে মানুষের ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করে তাহলে তো বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীদের সামনে নিজ পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পেশা গ্রহণ করা করা ছাড়া আর কোন উপায় খোলা থাকবে বলে তো মনে হয় না। আবার ধরুন, প্রায় সময়ই বিবর্তন-বিরোধীরা বেশ জাঁকিয়ে বসে বিজ্ঞানীদের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন - বাপু তোমরা ছোট খাটো পরিবর্তনগুলো নিয়ে হইচই করে কুল পাচ্ছো না, কই বড় বড় পরিবর্তনগুলোর (ম্যাক্রো-ইভলুশন) তো কোন প্রমাণ হাজির করতে পারছো না। বলছো ডায়নোসর থেকে পাখির বিবর্তন ঘটেছে, দেখাও তো দেখি তাদের মধ্যবর্তী স্তরগুলোরর বিবর্তনের নমুনা, কোথায় সেই মধ্যবর্তী ফসিল (transitional fossil) বা হারানো যোগসূত্রগুলো (missing link)? সমুদ্রের তিমি মাছ, ডলফিনরা নাকি একসময় জলহস্তিদের মত ডাঙ্গার প্রাণী ছিলো, তারপর কথা নেই বার্তা নেই একসময় নেমে গেলো পানিতে - এরকম অদ্ভুতুরে একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো তার মধ্যবর্তী ফসিলগুলো গেলো কোথায়? এ ধরণের চটকদার প্রশ্নগুলো একসময় বিবর্তনকে ঠেকানোর জন্য অত্যন্ত কার্যকরী ‘অস্ত্র’ ছিলো, কিন্তু ওগুলোর আবেদন অনেক আগেই ফুরিয়েছে। আসলে বিবর্তনবাদ বিরোধীদের জন্য গত শতাব্দীটা আসলে বেশ দুঃখজনকই ছিলো বলতে হবে। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের ফলে আমরা ক্রমাগত একটার পর একটা ফসিলের সন্ধান পেয়েছি, যা তাদের বেশীরভাগ প্রশ্নেরই সমাধান দিতে পারে। যদিও জীনের গঠন, কোষের ভিতরে মিউটেশন এর বিভিন্ন পর্যায় কিংবা ডি.এন.এ র গাঠনিক সংকেত ভেদ করার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা বিবর্তন সম্পর্কে অনেক তথ্যই বের করতে পেরেছেন, তারপরও ফসিল রেকর্ড ছাড়া বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা আক্ষরিক অর্থে অসম্ভবই বলতে হবে।

ফসিল রেকর্ডগুলো নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে আমরা প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কে কিছু মৌলিক তথ্য জানতে পারি, যেগুলো হয়তো শুধুমাত্র বর্তমানের জীবগুলোকে পরীক্ষা করে এতো সহজে জানা সম্ভব হতো না। পৃথিবীর দীর্ঘ সাড়ে তিনশো কোটি বছরের প্রাণের ইতিহাসের সরাসরি সাক্ষী এই ফসিলগুলো, তারা ধারণ করে রেখেছে এই গ্রহে প্রাণের অফুরন্ত কোলাহলের নীরব পদচিহ্ন। আমরা বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণীদের দেহের গঠন, সময়ের সাথে সাথে তাদের তুলনামুলক পরিবর্তন দেখতে এবং তা পরিমাপ করতে পারি ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরে খুঁজে পাওয়া ফসিলগুলোর মাধ্যমে। তারাই আমাদের বলে দিচ্ছে কত বিচিত্র রকমের জীবের অস্তিত্ব ছিলো এই ধরণীতে, তাদের মধ্যে কেউবা এখনও প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে, কেউবা হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে। ফসিল রেকর্ড থেকে একদিকে যেমন আমরা প্রাণের বিকাশের এবং বিবর্তনের ধারার সরাসরি কালানুক্রমিক প্রমাণ পাচ্ছি, পাচ্ছি প্রাগৈতিহাসিক সময়কার আবহাওয়া, জলবায়ু কেমন ছিলো তার নমুনা, জানতে পারছি কখন কোন প্রজাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, তেমনিভাবেই বুঝতে পারছি কখন গণবিলুপ্তির হাত ধরে হারিয়ে গেছে প্রজাতির পর প্রজাতি। আসলে আমরা ফসিল থেকে বিবর্তনের তত্ত্বের দু’টো মূল বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত পরিস্কার ধারণা পাই। এক হচ্ছে, প্রজাতির ভিতরেই কিভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন

জীবের গঠন এবং রূপের সেটি, আর তারপর এই ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলেই কখন জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন সব বৈচিত্রময় প্রজাতির।

আবার অন্যদিকে এই ফসিল রেকর্ডগুলো বিশেষ অবদান রেখেছে মহাদেশগুলো সরে যাওয়া বা মহাদেশীয় সঞ্চারণ এবং প্লেট টেকটোনিক্স এর তত্ত্ব আবিষ্কারের পিছনে। এই দু'টি বিষয় ভূতত্ত্ববিদ্যার জগতে বিপ্লব এনেছে - পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যায় অনু পরমানুর গঠন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কিংবা জীববিদ্যায় বিবর্তনবাদ যেমন অপরিহার্য ঠিক তেমনিভাবে ভুতত্ত্ববিদ্যার ভুবনে মৌলিক একটি তত্ত্ব হচ্ছে এই প্লেট টেকটোনিক্স (৪)। ফসিলের কথা বলতে গেলেই বিভিন্ন ধরণের শিলা, শিলাস্তর, কোন্ শিলা স্তরে কেন এবং কিভাবে ফসিল তৈরি হয় এই ধরণের প্রসংগগুলো চলে আসে। একমাত্র প্লেট টেকটোনিক্সের মাধ্যমেই এদের উৎপত্তি, গঠন এবং সঞ্চরনের ব্যাপারটা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

সেই ষোল'শ শতাব্দীতে, ১৫৯২ সালে, হল্যান্ডের আব্রাহাম ওরটেলিয়াস (Dutch map maker Abraham Ortelius) প্রথম বলেছিলেন যে, আমেরিকা মহাদেশ আসলে ইউরোপ এবং আফ্রিকা থেকে ভেঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিলো। তারপর তিন শতাব্দীরও বেশী সময় কেটে গেলো, এবার জার্মান আবহাওয়াবিদ অ্যালফ্রেড ওয়েগেনার বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া এই তত্ত্বটিকে আবার নতুন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেন ১৯১৫ সালে। তিনি বললেন, আদিতে সবগুলো মহাদেশ আসলে একসাথে ছিলো এবং এর নাম দিলেন 'প্যনজিয়া' বা 'সমগ্র পৃথিবী'। প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর আগে এই প্রকান্ড সুপার মহাদেশটি ভাঙ্গতে শুরু করে, তারপর থেকে ক্রমাগতভাবে তারা সরে যাচ্ছে এবং সরতে সরতে আজকের এই অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। ওয়েগেনার বললেন, আফ্রিকার পশ্চিম ধার এবং দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব ধারের খাঁজগুলো এক্কেবারে যেনো খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে, আবার ওদিকে বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে খুঁজে পাওয়া ফসিলের সাদৃশ্য দেখলেও বোঝা যায় যে তারা একসময় একসাথেই ছিলো। কোন সৃষ্টিকর্তা বিভিন্ন জীবকে সৃষ্টি করে বিভিন্ন মহাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এই ব্যাখ্যাটা যেমন বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহনযোগ্য নয়, ঠিক তেমনিভাবেই সেই আদিম কালে সমুদ্র মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই প্রাণীগুলো হাজার হাজার মাইল দুরের বিভিন্ন মহাদেশে পৌঁছে গিয়েছিলো তাও সঠিক বলে মনে হয় না। বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা ফসিলগুলোর প্যাটার্ন দেখলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। গ্রীষ্মমন্ডলীয় গাছের ফসিল কেনো পাওয়া যাচ্ছে বরফাচ্ছাদিত মহাদেশ অ্যান্টারকটিকায়, কিংবা গরম দেশের ফার্নগুলোর ফসিলই বা কেনো দেখা যাচ্ছে হিমশীতল মেরু অঞ্চলে? তাহলে কি এই অ্যান্টার্কটিকা একসময় দক্ষিণ মেরুর এত কাছাকাছি ছিলো না? বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে এধরনের আরও অনেক ফসিল খুঁজে পেয়েছেন - যেমন ধরুন, ডায়নোসরের চেয়েও পুরনো এক সরীসৃপ মেসোসরাসের ফসিল দক্ষিন আমেরিকা এবং আফ্রিকায় একই শীলাস্তরে খুঁজে পাওয়া গেছে, কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার লুপ্ত মারসুপিয়ালদের ফসিল পাওয়া গেছে অ্যান্টার্কটিকা এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে। শুধু তাই নয়, দেখা গেলো দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগের এবং স্তরের শিলাগুলোও মিলে যাচ্ছে একে অপরের সাথে। বিভিন্ন মহাদেশের শীলাস্তর ও ফসিলের মধ্যে সাদৃশ্য এবং এরকম তীব্র জলবায়ুর পরিবর্তনের একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে - এই মহাদেশগুলো এখন যে অবস্থানে রয়েছে অতীতে তারা সেখানে ছিলো না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সে সময় বিজ্ঞানীরা মহাদেশগুলোর স্থিরতায় বিশ্বাস করতেন, ওদিকে আবার ওয়েগেনারও এই বিশাল সঞ্চরণের কারণ কি হতে পারে তার কোন গ্রহনযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করতে পারলেন না। আর তার ফলে যা হবার তাই হল, বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বটিকে আবারও অগ্রাহ্য করলেন। কিন্তু ষাটের দশকে প্লেট টেকটোনিক্স তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বোঝা গেলো যে ওয়েগেনারের মহাদেশীয় সঞ্চরণের ধারণাটি আসলে সঠিকই ছিলো। ভূতাত্ত্বিক ম্যাপের উপর বিস্তৃত বিভিন্ন ধরণের শিলার গঠন বা প্যটার্ন, পাহাড়, ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরীর উৎপত্তি অথবা মহাদেশীয় সঞ্চরনের মত ব্যাপারগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া

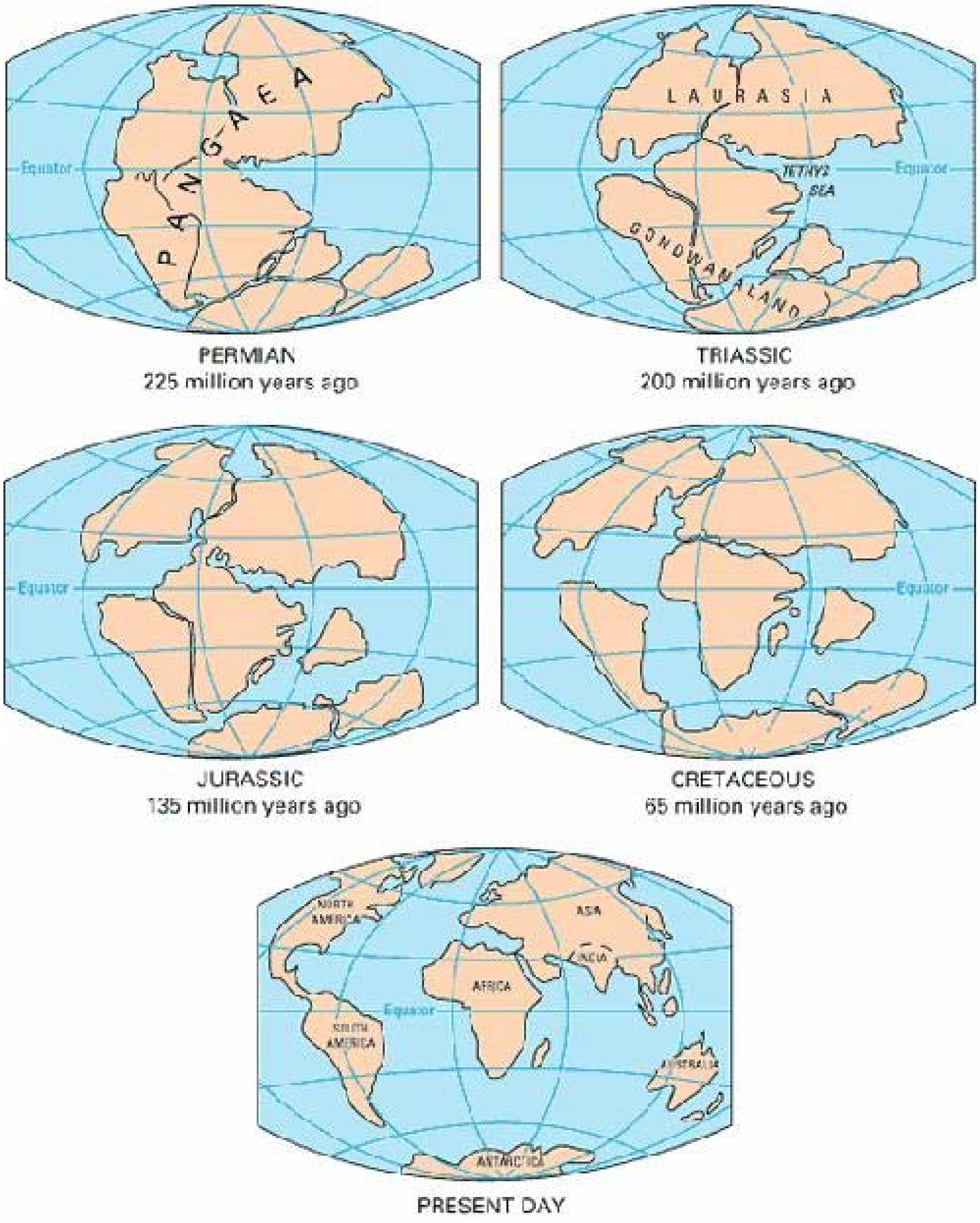

<u>মহাদেশীয় সঞ্চরন এবং তার বিভিন্ন পর্যায়</u>

সৌজন্যঃ http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/historical.html

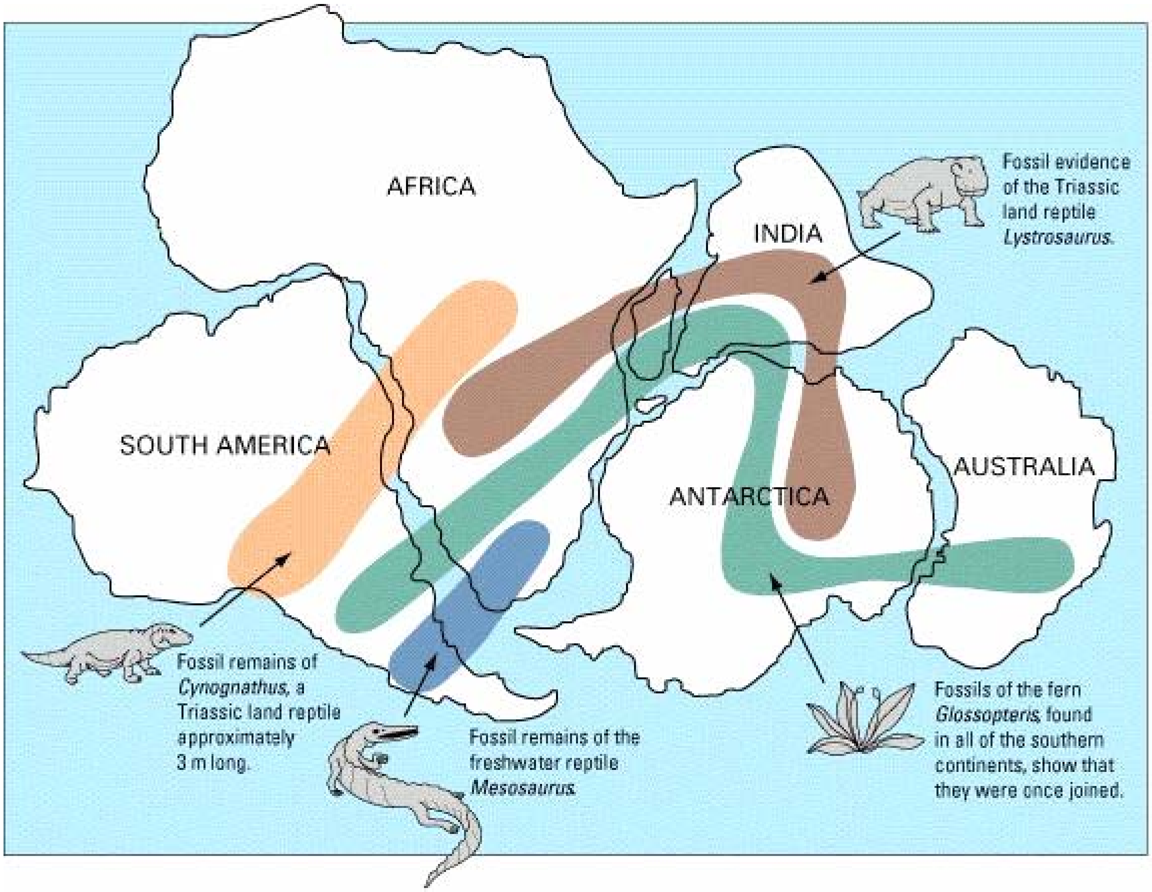

মহদেশীয় সঞ্চরণের তত্ত্ব যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে সব মহাদেশগুলোকে গুলোকে একত্রিত করে তাদের বিভিন্ন স্তরের ফসিল রেকর্ডগুলোকে দেখলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন দেখাতে বাধ্য হবে। ওয়েগেনার সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের এই ধারণাই শেষ পর্যন্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটা ফসিলের প্যাটার্ন দেখানো হল।

সৌজন্যঃ http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/continents.html

সম্ভব এই তত্ত্বের মাধ্যমেই। খুব সংক্ষেপে প্লেট টেকটোনিক্স তত্ত্বটাকে ব্যাখ্যা করতে হলে, ব্যাপারটা অনেকটা এরকম দাঁড়ায় ঃ ভূতাত্ত্বিক পরিভাষায় প্লেট বলতে বিশাল সলিড শীলার পাত বা ফলককে বোঝায় আর গ্রীক শব্দ টেকটনিক্স এর অর্থ হচ্ছে 'তৈরি করা', অর্থাৎ, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ বিভিন্ন ধরনের প্লেট দিয়ে তৈরি। লিথোস্ফেয়ার বলে যে উপরের স্তরটা মহাদেশগুলোকে এবং সমুদ্রের নীচের ক্রাস্ট বা ভূত্বককে ধারণ করে আছে তা আসলে ৮টি প্রধান এবং বেশ কয়েকটা আরও ছোট ছোট প্লেটের সমন্বয়ে গঠিত (৫)। এই প্লেটগুলো অনবরত তাদের নীচের আরও ঘন এবং প্লাস্টিকের মত স্তর আ্যাস্থেনস্ফেয়ারে দিকে সরে যাচ্ছে। এদের এই সঞ্চালনের গতি বছরে গড়পড়তা ৫-১০ সেন্টিমিটারের মত। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের মত কঠিন একটা জিনিসের এই নিত্য গতিময়তার কারণটা কি হতে পারে? আসলে পৃথিবীর গভীরে আটকে থাকা তাপ এবং তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের কারণে অনবরত যে তাপের সৃষ্টি হচ্ছে তা থেকেই সব কিছু গলে গিয়ে তৈরি হয় গলিত শীলার ধারা বা ম্যাগমা। এই গলিত শিলাগুলো ধীরে ধীরে মধ্য-সামুদ্রিক ভূশিরার (mid-ocean ridge, নীচের ছবিতে দেখুন; আটলান্টিক মহাসমুদ্রে লম্বালম্বিভাবে এধরণের একটি রিজ রয়েছে) মধ্য দিয়ে উলটো পথে উপরের দিকে চাপ দিতে থাকে। এর ফলে একদিকে যেমন সমুদ্রের তলদেশ বিস্তৃত হতে শুরু করে অন্যদিকে তার ফলশ্রুতিতে মধ্য-সামুদ্রিক ভূশিরার মধ্যে ফাটল বাড়তে থাকে। এই ম্যাগমাগুলো সমুদ্রের তলদেশ থেকে উপরে উঠে এসে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে আবার

নতুন ক্রাস্ট তৈরি করে (এই ম্যাগমা থেকেই সৃষ্টি হয় ইগনিয়াস শিলাস্তর) আর তাদের দুপাশের প্লেটগুলোকে বিপরীত দিকে ঠেলতে শুরু করে। এভাবে সরতে সরতে যখন কোন দু'টো প্লেটের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে তখন প্লেটগুলোর একটা আরেকটার নীচে চলে গিয়ে তাদের নীচের স্তর অ্যাস্থেনস্ফেয়ারের সাথে মিশে যেতে

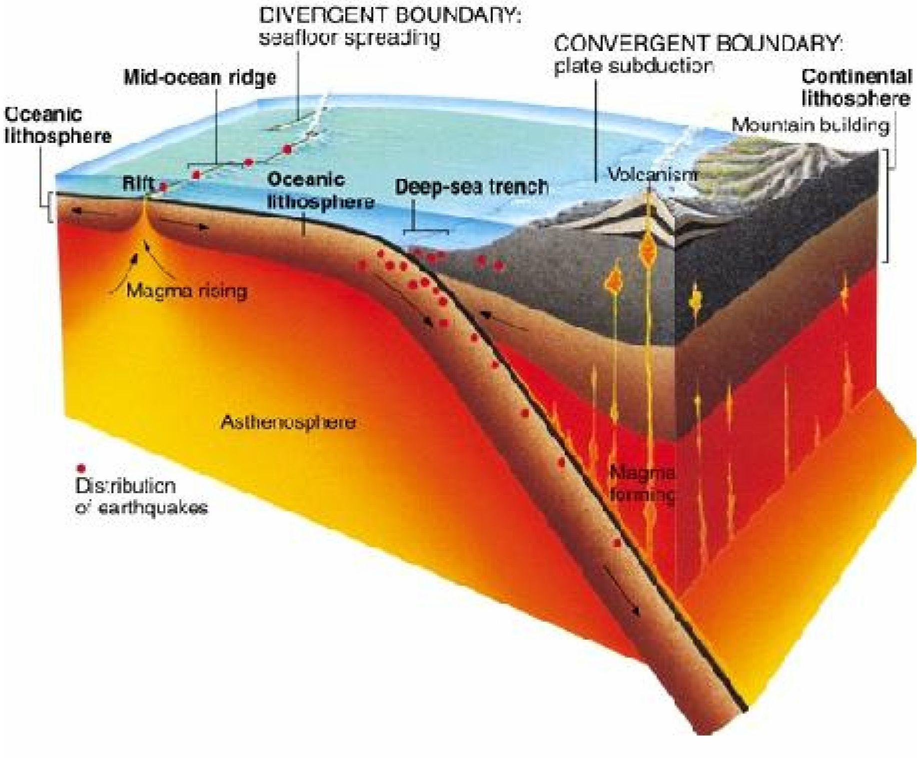

প্লেট টেকটনিক্স প্রক্রিয়া

সৌজন্যঃ http://earth.geol.ksu.edu/sgao/g100/plots/1203_03_plate.jpg

বাধ্য হয়। কিন্তু ভেবে দেখুন কি বিশাল এই সংঘর্ষ, ভূপৃষ্ঠের মত কঠিন একটা জিনিসের এক স্তর আরেক স্তরের মধ্যে ঢুকে গলে যাচ্ছে! এই সংঘর্ষের চাপে যে বিভিন্ন ধরনের প্রলয়ঙ্করী ঘটনার সুত্রপাত ঘটবে তাতে আর আবাক হওয়ার কি আছে? আর এ থেকেই সৃষ্টি হয় পর্বতমালার, ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে পৃথিবী, কিংবা কোন মহাদেশ ভেঙ্গে পরে। এরকম এক প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছে হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ। প্রায় ৮ কোটি বছর ধরে দক্ষিন দিক থেকে ক্রমাগতভাবে উত্তরের দিকে সরে আসতে থাকা ইন্ডিয়ান মহাসামুদ্রিক প্লেটের দক্ষিণ এশিয়ার সাথে সংঘর্ষের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিলো আমাদের এই বিশাল হিমালয় পর্বতমালার। প্রায় এক কোটি বছর আগে বহুদূরের আচেনা প্রতিবেশী ইন্ডিয়া মহাদেশ তার সব দুরত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় এশিয়ার মহাদেশের সাথে। হ্যা, ঠিকই ধরেছেন- হিমালয় মহাদেশের কোন অস্তিত্বই ছিলো না আজ থেকে কোটি বছর আগে! আমরা যতই বলি না কেন 'পাহাড়ের মত স্থির' আসলে পাহাড় কোনদিনও স্থির ছিলো না, আমাদের চারপাশের প্রকৃতি থেকে শুরু করে, পাহাড় পর্বত, মহাদেশ, মহাসমুদ্র এমনকি আমরা নিজেরাই কখনও স্থির ছিলাম না! অনবরত পরিবর্তন ঘটে চলেছে সব কিছুর। উপরের মহাদেশীয় সঞ্চরণের ছবিতেই খেয়াল করলে

দেখতে পাবেন কিভাবে সময়ের সাথে সাথে পুরনো ইন্ডিয়া মহাদেশ সরতে সরতে এসে এশিয়া মহাদেশের সাথে মিলে গিয়েছিলো।

সে যাই হোক, চলুন আবার ফিরে যাওয়া যাক আমাদের সেই ফসিলের গল্পে। আসলে ফসিলের সাথে ভূতত্ত্ববিদ্যা এবং বিবর্তনবিদ্যার মৌলিক কিছু আবিষ্কার এত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, তাদেরকে বাদ দিয়ে পুরো গল্পটা বলা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। গত কয়েক শতাব্দীর বিভিন্ন ধরণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পিছনেই ফসিল রেকর্ড অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। আবার ঠিক উলটোভাবে ফসিলের উৎপত্তি, গঠন এবং তাদের কালনির্ণয়ের কথা জানতে হলে প্লেট টেকটোনিক্স বা মহাদেশীয় সঞ্চরন বা কার্বন ডেটিং এর মত ব্যাপারগুলো না বুঝলেও তো আর চলছে না তাই ফসিলের কথা বলতে গেলেই বারবার চলে আসে ওই প্রসংগগুলো। কিন্তু এদিকে আবার সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা প্রায়ই আভিযোগ করে থাকেন যে, এত কম সংখ্যায় পাওয়া ফসিল দিয়ে নাকি বিবর্তনের তত্ত্ব কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না। প্রমাণ হয় কি হয় না, সে প্রসঙ্গে না হয় একটু পরে আসছি; তবে ফসিলের অপ্রতুলতার কথাটা কিন্তু নিছক মনগড়া নয়। সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসীদের বিশ্বাসগুলো কল্পনাপ্রসুত হলেও তাদের এই অভিযোগটা কিন্তু বৈজ্ঞানিকই বলতে হবে! তারা ঠিকই বলেন যে ফসিলের সংখ্যা পৃথিবীর বুকে জন্ম নেওয়া বিভিন্ন প্রজাতির জীবের সংখ্যার তুলনায় সত্যিই তো খুবই কম। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যে, প্রায় আড়াই লাখ প্রজাতির ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন তা অতীত এবং বর্তমানের সমস্ত জীবের শতকরা একভাগেরও প্রতিনিধিত্ব করে কিনা সন্দেহ আছে(৪)। কিন্তু এই ফসিলগুলো আসলে কি? কিভাবেই বা মাটি বা পাথরের ভাঁজে ভাঁজে তারা সংরক্ষিত হয়ে যায়, লক্ষ কোটি বছর পরেও তারা কিভাবে প্রমাণ দিয়ে যায় সেই সময়ের জীবনের অস্তিত্বের? অতীতের বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক সময়ের জীবের দেহাবশেষ বা চিহ্নগুলো যখন পাললিক শিলার স্তরে স্তরে সংরক্ষিত হয়ে যায় তাকেই বিজ্ঞানীরা ফসিল বলেন। যদিও ফসিলে পরিণত হতে হাজার হাজার বছর লেগে যায়, ঠিক কতদিন পরে কোন জীবের দেহাবশেষকে ফসিল বলে ধরা হবে তা নিয়ে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন ধরণের শিলা থাকলেও শুধুমাত্র পাললিক শীলার বিভিন্ন স্তরেই ফসিল তৈরি হতে পারে, ইগনিয়াস বা মেটামরফিক শীলার মধ্যে জীবদেহ ফসিল হিসেবে সংরক্ষিত হতে পারে না।

ফসিল কিভাবে তৈরি হয় তা বুঝলে হয়তো এই সমস্যাটার অর্থপূর্ণ একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। একটা জীবের দেহের মৃত্যু বরণ করা থেকে শুরু করে তার ফসিলে পরিণত হওয়া এবং একজন বিজ্ঞানীর

গাছের কষের মধ্যে সংরক্ষিত বিলুপ্ত একধরণের বিছার ফসিল

সৌজন্যঃ ন্যাশনাল হিস্টরী মিউজিয়ামঃ http://www.a mnh.org/exhibitions/amber/scorpion.html

তা আবিষ্কার করা পর্যন্ত ধাপে ধাপে যে পদ্ধতিগুলোর মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়, তা শুধু দীর্ঘই নয়, অত্যন্ত আকস্মিকও বটে। ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা এই ঘটনাগুলো ঘটাটাই যেনো এক অস্বাভাবিক ঘটনা! কিন্তু তারপরও আমরা কিভাবে যে হাজার হাজার ফসিলের সন্ধান পেয়েছি এবং এখনও পেয়ে যাচ্ছি তা ভেবেই অবাক না হয়ে পারা যায় না। মৃত প্রাণীদেহের নরম অংশগুলো খুব সহজেই পঁচে গলে নষ্ট হয়ে যায় বা অন্য কোন প্রাণীর খাদ্যে পরিণত হয়। তাই যে সব প্রাণীদের দেহে শক্ত হাড়, দাঁত, শেল বা কাঁটা নেই সেগুলোর ফসিলও খুব সহজে পাওয়া যায় না। তবে মাঝে মাঝে দু'একটা যে পাওয়া যায় না তাও কিন্তু নয়, সেগুলো হয়তো বিশেষ কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। যেমন ধরুন গাছের কষের মধ্যে বেশ কিছু পিঁপড়া বা পোকা মাকড়ের ফসিল পাওয়া গেছে যারা বেশ ভালোভাবেই সংরক্ষিত হয়ে ছিলো, আবার উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর হিমশীতল তুষারস্তুপের মধ্যে জমে গেছে এমন কিছু অতিকায় ম্যামথেরও ফসিল পাওয়া গেছে। অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা বা গাছের ফসিলগুলো শিলাস্তরের চাপের ফলে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে পাথরের উপর একধরনের প্রিন্ট বা ছাপের মত তৈরি করে। কয়লার খনিতে এরকমের প্রচুর ফসিল দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি কোন কোন সময় বিভিন্ন প্রাণীর পায়ের ছাপ বা মলও ফসিলে পরিণত হয়ে যায়। যেমন ধরুন প্রায় ৩৬ লক্ষ বছর আগে

জুরাসিক পিরিয়ডের (২০০ মিলিয়ন বছর আগের) ডাইনোসর এর পায়ের ছাপের ফসিল সৌজন্যঃ

http://www.paleoportal.org/fossil_gallery/taxon.php?taxon_id=111

প্রায় ৩৬ লক্ষ বছর আগের মানুষের পূর্বপুরুষ প্রজাতি *Australopithecus afarensis* এর পায়ের ছাপ। সৌজন্যঃ

http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/laetoli.htm

তানজেনিয়ার কোন বিস্তীর্ণ জনপদে আগ্নেয়গিরি থেকে ছড়িয়ে পড়া ভস্মের মধ্যে হঠাৎ করে সংরক্ষিত হয়ে যাওয়া *Australopithecus afarensis* প্রজাতির পায়ের ছাপগুলো এখনও আমাদের পূর্বপুরুষের দু'পায়ে চলে বেড়ানোর সাক্ষ্যবহন করে চলেছে। ফসিল হয়ে যাওয়া মল বা বিষ্ঠা থেকেও আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারি, যেমন কি ধরণের খাদ্য খেতো তারা, সেই অঞ্চলে কি ধরণের গাছপালা বা পশু পাখি জন্ম নিত সে সময়ে, সেই রকমের গাছপালার জন্য কি রকম জলবায়ুর প্রয়োজন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে, সাধারণত প্রাণী বা উদ্ভিদের এই নরম অংশগুলো নয়, বরং দাঁত, হাড়, শক্ত খোলস বা

শেল, শক্ত বীজ বা বীজগুটি জাতীয় অংশগুলোই ফসিলে পরিণত হয়। কিন্তু এই শক্ত অংশগুলোর ফসিল হওয়ার সম্ভবনা সবচেয়ে বেশী থাকলেও তাদের বেশীরভাগই তো পাথরের চাপে, শক্ত কিছুর আঘাতে বা পানির স্রোতের ঘষায় বা অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে ভেঙ্গেচুড়ে একাকার হয়ে যায়!

এ তো না হয় গেলো জীবের দেহের কোন অংশ ফসিল হতে পারবে আর কোন অংশ পারবে না তার বর্ণনা। কিন্তু সমস্যার তো আর এখানেই শেষ নয়, বরং যেনো অনেকটা শুরুই বলা চলে। ফসিল তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ার মাঝেও যেনো লুকিয়ে রয়েছে একের পর এক আকস্মিকতার বেড়াজাল ডিঙোনোর প্রতিযোগীতা! একটা জীবের দেহকে ফসিল হিসেবে সংরক্ষিত হতে হলে ধাপে ধাপে কতগুলো বিশেষ অবস্থা এবং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। শুধুমাত্র পাললিক শিলার মধ্যেই ফসিলের সংরক্ষণ ঘটতে পারে বলে পলি অঞ্চলের কাছাকাছি জায়গাগুলোতে বাস করা জীবদের দেহ খুব সহজে ফসিলে পরিণত হতে পারে। আর স্বাভাবিক কারণেই এরকম অঞ্চল থেকে যত দূরে সরে যেতে থাকবেন ততই কমতে থাকবে ফসিলের পরিমাণ(৬)। অর্থাৎ, এইসব পলি অঞ্চলে যে সব জীব বাস করতো সেইসব প্রজাতির হয়ত ভুড়িভুড়ি ফসিল পাওয়া যাবে, কিন্তু অন্যান্য প্রজাতির অস্তিত্বই কখনও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন ধরুন, কোন জীবের দেহ প্রাথমিক এই বাঁধাগুলো পেরিয়ে ফসিল তৈরির জন্য মোক্ষম কোন পরিবেশে সঠিকভাবেই সংরক্ষিত হলো। এর পরেও কিন্তু তাকে আবার ভুমিকম্প, অগ্নুৎপাত বা প্লেট টেকটোনিক্সের কারণে পৃথিবীর বুকে যে ভাঙ্গা গড়ার অবিরাম খেলা চলছে তার ধাক্কা এড়িয়ে হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকতে হবে যাতে করে আমাদের প্রজন্মের কোন বিজ্ঞানী তা খুঁজে বের করতে পারেন। এখন পৃথিবীর ভিতরে লুকিয়ে থাকা এই শিলা স্তরটি টেকটোনিক সঞ্চালনের মাধ্যমে যদি অনাবৃত বা প্রকাশিত হয়ে না পড়ে বা বিশেষ কোন কারণে বিজ্ঞানীরা যদি সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন না করেন তাহলে হয়তো সেই ফসিলগুলো অচেনাই থেকে যাবে আমাদের কাছে চিরতরে।

চলুন,কঠিন বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলোকে বাদ দিয়ে, খুব সহজ একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখা যাক ফসিল কিভাবে তৈরি হয়ঃ লন্ডনের ন্যাশনাল হিস্টোরী মিউজিয়ামের ওয়েব সাইটে বিলুপ্ত এক সামুদ্রিক স্কুইডের ফসিলে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে বেশ সহজ করে ব্যখ্যা করা হয়েছে। ধরুন জুরাসিক যুগের এক স্কুইড বিশাল সমুদ্রে ঘুরে ফিরে বেড়াতে বেড়াতে বুড়ো হয়ে একদিন মরে গেলো, তারপর তার মৃতদেহটা গিয়ে পড়লো সমুদ্রের তলদেশে। বড় কোন মাছ বা হাঙ্গড়ের শিকার হল না সে, ছোট ছোট মাছগুলো ঠুকড়ে ঠুকড়ে তার শরীরের নরম অংশগুলো খেয়ে শক্ত কঙ্কালটাকে ফেলে চলে গেলো। এ সময়েই বেশ বড়সড় একটা ঝড় উঠলো আর এই স্কুইডের কঙ্কালটা পঁচে গলে মিশে যাওয়ার আগেই কাঁদামাটি বালি এসে একরাশ পলির স্তর তৈরি করে ফেললো তার উপর। এভাবে হাজার, লক্ষ, এমনকি কোটি বছর ধরে যত পলির স্তর বাড়তে থাকলো ক্রমশঃ ততই সে মাটির আরও গভীরে ঢুকে যেতে থাকলো। এদিকে আবার পলি মাটির ভিতরের স্তরের সব পানি ধীরে ধীরে নিংড়ে বের হয়ে গিয়ে তা

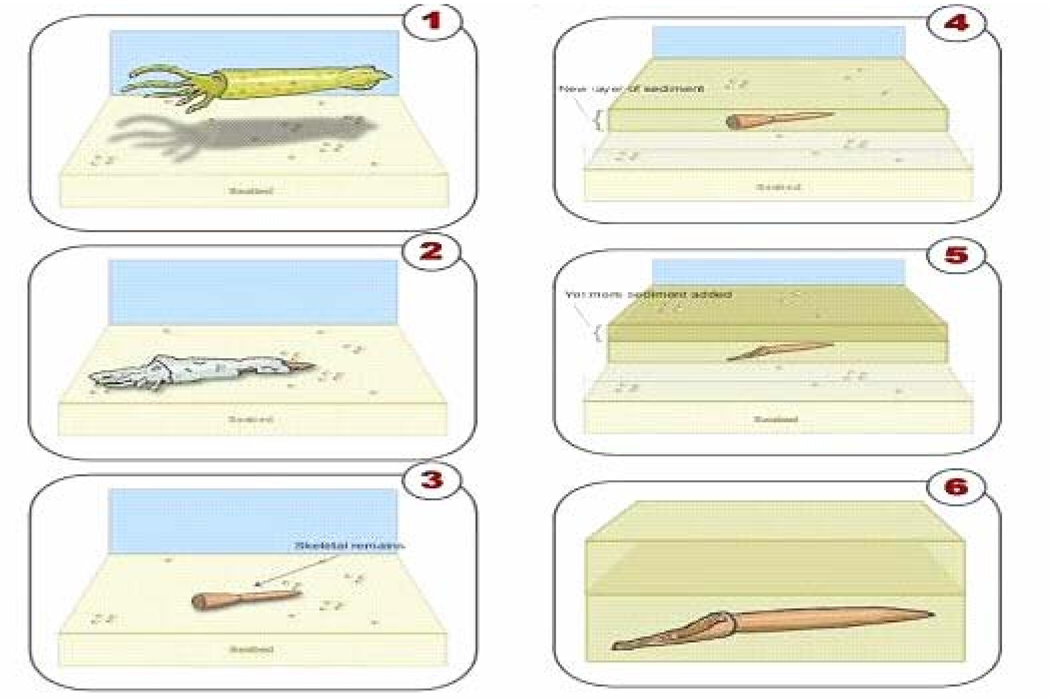

ফসিল তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ঃ
সৌজন্যঃ http://www.nhm.ac.uk/nature-online/earth/fossils/fossil-folklore/how_are_fossils.htm#

সিমেন্টের মত শক্ত হয়ে যেতে থাকে এবং একসময় তা পাললিক শিলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর দেখা গেলো, আমাদের সেই ভাগ্যবান (ভাগ্যবতী) স্কুইডটি আবারও এই শিলা তৈরির প্রক্রিয়ায় ধ্বংস হয়ে না গিয়ে দিব্যি ফসিলে পরিণত হয়ে গেছে। তার হাড়ের অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর অংশগুলো গুড়িয়ে গেলেও, দ্রবীভুত হয়ে যেতে পারে এমন অংশগুলো পানিতে মিশে গেলেও, ক্যালসাইট নামক অত্যন্ত শক্ত খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি চারপাশের আবরণটি কিন্তু ঠিকই ফসিল হিসেবে টিকে গেছে!

তাহলে দেখা যাচ্ছে ফসিল তৈরির পদ্ধতিটা নিতান্তই আকস্মিক, এবং বহু চড়াই উৎড়াই পেড়িয়ে এই ফসিল রেকর্ডগুলোকে টিকে থাকতে হয়। আসলেই এটা আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতার জন্য একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার যে এত ঝক্কি ঝামেলা পেরিয়েও কোন না কোন ভাবে কিছু জীবের ফসিল সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে আর আমরা প্রতিদিনই হাজার হাজার ফসিলের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছি। আর বিজ্ঞানীরা যেরকম নিয়মিতভাবে একটার পর একটা নতুন নতুন ফসিল আবিষ্কার করে চলেছেন তাতে করে এটাও তো আর বুঝতে বাকি থাকে না যে নিশ্চয়ই আরও অসংখ্য প্রজাতির জীবের ফসিল মাটির বুকে বা গাছের কষে বা হিম শীতল তুষার স্তূপে লুকিয়ে রয়েছে। আমি যখন এই অধ্যায়টা নিয়ে লিখতে বসেছি তখনই বিজ্ঞানীরা কানাডার উত্তর মেরুতে খুঁজে পেয়েছেন আরেকটি গুরুত্ত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী ফসিল বা মিসিং লিঙ্ক। প্রায় ৩৮ কোটি বছর আগের চারপায়ী এই মাছটি জলের মাছ এবং জল থেকে চার পায়ে ভর করে ডাঙ্গায় উঠে আসা প্রাণীগুলোর মধ্যে পরিষ্কার যোগসূত্র স্থাপণ করেছে। বিজ্ঞানীরা জল থেকে ডাঙ্গায় বিবর্তনের এই তত্ত্ব আনেক আগেই দিয়েছিলেন, কিন্তু এত পরিষ্কারভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো প্রমাণ বোধ হয় পেলেন এই প্রথম। এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ মিসিং লিঙ্কগুলো নিয়ে এর পরে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছে আছে।

ডাইনোসর থেকে পাখির রূপান্তরই বলুন আর তিমি মাছের ডাঙ্গা থেকে আপাতদৃষ্টিতে উলটো পথে জল-গমনের বিবর্তনের উপাখ্যানই বলুন - এই মিসিং লিঙ্কগুলো কিন্তু বিবর্তনের গল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়, এদের বাদ দিয়ে বিবর্তনের কোন গল্পই সম্পুর্ন হতে পারে না। আর এ ধরণের আবিষ্কারগুলোর পিছনে রয়েছে আমাদের সেই প্রাচীন ফসিল রেকর্ডগুলো। এরা যেন সেই বহুকল্পিত টাইম মেশিন, যার মাধ্যমে আমরা অতীতের কোটি কোটি বছরের প্রাণের মহাযাত্রায় শরীক হতে পারি, পৌঁছে যেতে পারি বিবর্তনের ইতিহাসের সেই অজানা প্রাগৈতিহাসিক অধ্যায়গুলোতে। হ্যাঁ, পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া লক্ষ লক্ষ জীবের তুলনায় খুঁজে পাওয়া ফসিলের সংখ্যা নিতান্তই কম, কিন্তু ঘুড়ে দাঁড়িয়ে উলটো করে প্রশ্ন করতে হলে বলতে হয়, তারা জীবের বিবর্তনের পক্ষে কতটুকু দৃঢ় সাক্ষ্য বহন করে চলেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা চোখ বন্ধ করে বলবেন যে, ফসিল রেকর্ডগুলোর মাধ্যমে আমরা বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপগুলোকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর এখনও না পাওয়া গেলেও এর থেকে আমরা প্রাণের বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে যে একটা ব্যাপক ধারণা আমরা লাভ করি তাকে কোনভাবেই নগন্য বলে ফেলে দেওয়া যায় না। এ যেনো অনেকটা যাদুঘরে সংরক্ষিত হাজার বছরের পুরনো অতিকায় সেই প্রাচীন পুঁথিটা - তার অনেক পৃষ্ঠা ছিঁড়ে গেছে, কখনও কখনও অধ্যায় ধরেই হয়তো হারিয়ে গেছে, কিন্তু তারপরও বাকি হাজারও পৃষ্ঠায় যে কাহিনী এবং জোড়ালো প্রমাণগুলো লিপিবদ্ধ করা আছে তা দিয়ে আমরা দিব্যি সে সময়টা সম্পর্কে অত্যন্ত স্বচ্ছ একটা ধারণা লাভ করতে পারি, দৃঢ় আস্থা নিয়ে উপসংহারটাও টানতেও পারি। আর প্রতিদিনই আমরা যত নতুন নতুন ফসিল খুঁজে পাচ্ছি ততই যেনো একটা একটা করে সেই ছেঁড়া পৃষ্ঠাগুলো জুড়ে দেওয়া হচ্ছে বইটার ভিতর আর ক্রমশঃ জ্বলজ্বল করে পরিষ্কার হয়ে উঠছে ইতিহাসের রং তুলিতে আঁকা প্রাণের বিবর্তনের ছবিটা।

চার্লস ডারউইন যখন তার 'অরিজিন অফ স্পিশিজ' বইটাতে বিবর্তনের সাক্ষ্য হিসেবে ফসিল রেকর্ডগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত লিখছিলেন তার অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করেছিলেন যে, এই বুড়ো পৃথিবী ধাপে ধাপে সৃষ্টি হয়েছে(৭)। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন শীলার স্তরে স্তরে ক্রমানুয়িকভাবে খুঁজে পাওয়া ফসিলগুলো তাদের এই সন্দেহকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছিলো। আর তারপর গত শতাব্দীতে যে অসংখ্য পরিমাণ ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে তা দিয়ে আমরা বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে অত্যন্ত জোড়ালো প্রমাণ পাই। আর আজকে তো বিজ্ঞান আর সেখানেই আটকে নেই, বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ দিয়ে চলেছে বিজ্ঞানের আরও বিভিন্ন শাখা। জেনেটিক্সের আলোয় আমরা এই ফসিল রেকর্ডগুলোকে আবার নতুন করে খতিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি। এটা তো আর কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না যে, ফসিল রেকর্ডগুলো আমাদেরকে শত শত বছর ধরে যা বলে আসছে, বিজ্ঞানীরা তাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার সাথে গত কয়েক দশকের অনু জীববিদ্যা এবং জেনেটিক্সের আবিষ্কারগুলো হুবহু মিলে গেলো! বিভিন্ন জীবের ডি.এন.এ থেকেই আজকে আমাদের পক্ষে সম্ভব তার বিবর্তনের ইতিহাসটা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা, আর ফসিল রেকর্ডগুলো তো আছেই তার পাশাপাশি সম্যক প্রমাণ হিসেবে।

এর পরে ভূতাত্ত্বিক বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্তরে বিবর্তনের সাক্ষী হিসেবে ব্যাপক পরিমাণে যে সব ফসিল পাওয়া গেছে এবং তার সাথে ভুতাত্ত্বিক সময় ও কার্বন ডেটিং এর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো।

চলবে...

References:

1. Fossil 1. Feathered bird: Dr. Douglus J Futuyma (2005), Evolution, pg.75, Sinauer Associates,

INC, MA, USA.
And: http://www.cbc.ca/story/news/national/2003/01/22/dino_wings030122.html

2. Fossil2: salix sp.from Tertiary Period
http://www.paleoportal.org/fossil_gallery/search.php?taxon_id=&period_id=8

3. Fossil 3. Lucy: Natural history Museum, London: http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2005/july/news_5976.html

4. Dr. Douglus J Futuyma (2005), Evolution, pg.71 Sinauer Associates, INC, MA, USA

5. Dr. Douglus J Futuyma (2005), Evolution, pg.68 Sinauer Associates, INC, MA, USA

6. Ridley, Mark (2004), Evolution, pg 384; BlackwellPublishing, Oxford, UK

7.Dr. Berra, M, Tim (1990), Evolution and the Myth of Creationism. Stanford pg. 52

বন্যা আহমেদ বর্তমানে আমেরিকায় সিস্টেম অ্যানালিস্ট হিসেবে কর্মরত। এর আগে কাজ করেছেন টেলি কমিউনিকেশনস ইন্ডাসট্রিতে, ফাইবার অপটিক্সের নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রায় ৭ বছর। লেখাপড়া করেছেন বায়োটেকনলজি এবং কম্পিউটার সায়েন্সে। ইমেইল : bonna_ga@yahoo.com